ভারত থেকে অর্থনৈতিক সম্পদের নির্গমন বা অপহার

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বাংলা ও ভারতের অন্যান্য প্রান্তে ব্রিটিশ শাসনের ফলস্বরূপ প্রতিদানহীন যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও মূল্যবান সম্পদের বহির্গমন ঘটে তাকেই অর্থনীতিবিদরা অর্থনৈতিক নিষ্ক্রমণ বা Economic Drain আখ্যা দিয়েছেন। পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের পর ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলা থেকে নজরানা, উপঢৌকন, পারিতোষিক, উৎকোচ ও ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যের আকারে অপরিমিত সম্পদ ও ধনভাণ্ডার দেশে নিয়ে গেলে তাকে "পলাশির লুণ্ঠন" আখ্যা দেওয়া হয়। "পলাশির লুণ্ঠন" বা "Plassey Plunder" কথাটি সর্বপ্রথম ব্রুকস অ্যাডামস (Brooks Adams) নামক গবেষক ব্যবহার করেন। পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের পর রবার্ট ক্লাইভ স্বয়ং বাংলার নবাবদের কাছ থেকে বিপুল অর্থ আদায়ের পথ দেখান যা পরবর্তী প্রশাসকরা অনুসরণ করেন। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্য কোম্পানির পদস্থ কর্মচারীরা এই উপায়ে ৫০ কোটি টাকা দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। এইভাবে ইংরেজ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে "পলাশির লুণ্ঠনের" যে অভিযোগ ওঠে তা ভেরেলেস্ট, ফিলিপ ফ্রান্সিস ও ওয়ারেন হেস্টিংসের মতো ইংরেজ প্রশাসকরা এবং ইংরেজ চিন্তাবিদ এডমন্ড বার্ক স্বীকার করে নিয়েছেন। বাংলা থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ নির্গমনের এই প্রক্রিয়াকে অর্থনীতিবিদ অম্লান দত্ত অপহার আখ্যা দিয়েছেন। ব্রিটিশ শাসনকালে ভারত থেকে সম্পদ নিষ্কাশন প্রসঙ্গে দাদাভাই নৌরজী তাঁর ১৮৭১ সালে প্রকাশিত প্রখ্যাত গ্রন্থ 'Poverty and Un-British Rule in India'-য় যথার্থভাবেই বলেছেন, "The romance is the beneficence of the British rule and the reality is the bleeding of the British rule"। অর্থাৎ, ব্রিটিশ শাসনের বদান্যতা বা হিতকারী প্রভাব হল রোমান্টিক ভাবনা, আর ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃত স্বরূপ হল রক্তক্ষরণ। নৌরজী তাঁর এই গ্রন্থে সম্পদ নির্গমনের তথ্যই শুধু দেননি, তিনি একথাও প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ভারতীয় জনগণের চরম দারিদ্র্য এই নিঃসরণেরই প্রত্যক্ষ ফল। কারণ ভারতীয়রা তাদের সম্পদ নিষ্ক্রমণের বিনিময়ে ইংল্যান্ডের কাছ থেকে সমমূল্যের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক বা বস্তুগত বিনিময়জাত দ্রব্য পায়নি। কার্ল মার্কস স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে ভারতবর্ষ থেকে ইংল্যান্ডে সম্পদ নিষ্কাশন ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংসাত্মক দিক।

ভারত থেকে ইংল্যান্ডে যে পথে সম্পদ নির্গমন হয়েছিল তার মধ্যে প্রধান হল কোম্পানির প্রশাসক ও কর্মচারীদের দ্বারা উপঢৌকন, পারিতোষিক ও নজরানা আদায়, কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য, ইংরেজ কোম্পানির ভারতে বাণিজ্যের জন্য বিনিয়োগ বা ইনভেস্টমেন্ট, সরাসরি কর আরোপের মাধ্যমে লুণ্ঠন, চীনের আফিম বাণিজ্য, আমদানির চেয়ে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি ও বাণিজ্য ঘাটতি, ব্রিটিশ কর্মচারীদের

বেতন, সর্বোপরি সরকারি খরচে যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ইত্যাদি। পলাশির যুদ্ধের পর থেকে বাংলার সিংহাসনে একের পর এক নবাব বসিয়ে কোম্পানির পদস্থ কর্মচারীরা বিপুল অর্থ আয় করেন। উপঢৌকন গ্রহণের মাধ্যমে এবং অন্যান্য অবৈধ উপায়ে উপার্জনের ফলে বিপুল অর্থ বাংলা থেকে ইংল্যান্ড চলে যায়। মার্কস ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ডে দেখিয়েছেন, ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬-র মধ্যে শুধু উপহার হিসেবে ৬ মিলিয়ন পাউন্ড ভারতের বাইরে চলে যায়। (মীরকাশিমকে বাংলার মসনদে বসানোর বিনিময়ে ভ্যান্সিটার্ট, কলকাতা কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্য ও সেনাদল মোট ৩২,৭৮,০০০ টাকা আদায় করেন।) ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে মীরজাফরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নজম-উদ-দৌল্লাকে সিংহাসনে বসিয়ে কলকাতা কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্য ৬২,৫০,০০০ টাকা পেয়েছিলেন। নায়েব নাজিম পদ লাভের জন্য রেজা খাঁ-কে কোম্পানির কর্মচারীদের ৪,৭৬,০০০ টাকা উপঢৌকন দিতে হয়। ওয়ারেন হেস্টিংসও বেনারসের রাজা চৈত সিং, অযোধ্যার বেগম প্রমুখের কাছ থেকে অনৈতিকভাবে বিপুল অর্থ আদায় করেন। এছাড়া তিনি অবৈধ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে তাঁর অনুগামীদের বিপুল অর্থ পাইয়ে দিয়েছিলেন। হেস্টিংস স্বনামে ও বেনামে বহু বেআইনি চুক্তি স্বাক্ষর করেন যা তাঁর ইমপিচমেন্টের সময় প্রকাশ পায়। হেস্টিংসের এই অবৈধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন চার্লস ব্রান্ট, চার্লস ক্রাফট, সুলিভ্যান প্রমুখ যারা বাঁধ নির্মাণ, আফিম যোগান এবং সামরিক বাহিনীতে মাংস ও অন্যান্য সামগ্রী যোগান দিয়ে বিপুল অর্থ রোজগার করেছিল। ক্লাইভের প্রদর্শিত পথে ফ্রান্সিস সাইকস্ (Francis Sykes) মাত্র দু'বছরে ১২ লক্ষ টাকা উপার্জন করেন এবং বারওয়েল উপঢৌকন ও অন্যান্য অনৈতিক উপায়ে ৮০ লক্ষ টাকা কামিয়ে নেন। এইভাবে বিপুল অর্থ ইংল্যান্ডে নিয়ে গিয়ে তারা "ভারতীয় নবাবের" মতো জীবন কাটাতে থাকেন।

কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের মাধ্যমেও বিপুল অর্থ ভারতের বাইরে চলে যায়। ড. নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ মন্তব্য করেন যে, উপঢৌকন বাবদ কোম্পানির কর্মচারীরা যত অর্থ পায় তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থ অবৈধ বাণিজ্যের মাধ্যমে লাভ করে। ব্রিটেনে ফ্রি মার্চেন্ট বলে পরিচিত ব্যক্তিরাও ভারতবর্ষে ব্যক্তিগত বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। কোম্পানির পরিচালক সভা তাদের ভারতীয় বণিকদের মতোই ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার দিয়েছিল। এছাড়া কোম্পানির এজেন্টরা উৎপাদকদের কাছ থেকে আফিম, রেশম প্রভৃতি পণ্য কেনার সময় তাদের কাছ থেকে সেলামি বা দস্তুরি আদায় করত। উৎপাদকরা পণ্যের দামেরই একাংশ সেলামি হিসেবে দিতে বাধ্য থাকত, কারণ তা না দিলে এজেন্টরা নানা অজুহাতে সেই পণ্য কিনত না। এইভাবে উপঢৌকন, উৎকোচ, বেআইনি চুক্তি, অনৈতিক শোষণ ও ব্যক্তিগত বাণিজ্যের মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ কোম্পানির কর্মচারীরা উপার্জন করেছিল তার একটি বড় অংশ দামি রত্ন বা হিরের (diamond) মাধ্যমে দেশে পাঠিয়ে দিত। এরফলে বাংলা থেকে অসংখ্য

হিরে ও দামি রত্ন বিলেতে চলে যায়। অনেক ইংরেজ বণিক আবার তাদের উপার্জিত অর্থ কোম্পানির তহবিলে জমা রাখত। পরে দেশে ফিরে পরিচালক সভার কাছ থেকে অফ এক্সচেঞ্জ ভাঙিয়ে টাকা তুলে নিত। অনেকে আবার ফরাসি, ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি ইউরোপীয় কোম্পানির মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠাত। বারওয়েলের লেখা চিঠি থেকে জানা যায় যে, তাঁর উপার্জিত ৮০ লক্ষ টাকা তিনি কীভাবে পাঠিয়েছিলেন। কলকাতা, বোম্বাই, জেদ্দা, এলেপ্পো, বেসরা, কায়রো প্রভৃতি বিশ্বের বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে তিনি টাকা পাঠিয়েছিলেন। বাংলা তথা ভারতে সম্পদ নিষ্কাশনের চাপ বেশি অনুভূত হয়েছিল, কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তের (যেমন অস্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি স্থানে) মতো ইংল্যান্ডের জনগণ ভারতে বসতি স্থাপন করে নতুন মূলধন অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দেয়নি। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের পর যখন ইংরেজদের ভারতে বসবাসের নিয়ন্ত্রণবিধি অনেকটা শিথিল হয় ততদিনে ইংরেজরা অন্যান্য উপনিবেশে বসবাস শুরু করে দিয়েছিল। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার রেসিডেন্ট জন বেব লিখেছেন, দূরের এক দেশের অধীনে আরেকটি দেশ থেকে এইভাবে ধারাবাহিক সম্পদ নিষ্কাশন অধীন দেশেরই ক্ষতি করে।

ইংরেজ কোম্পানির ভারতীয় বাণিজ্যে বিনিয়োগ বা ইনভেস্টমেন্টের মাধ্যমে বিপুল অর্থ নিষ্কাশিত হয়। কোম্পানি ভারতের বাজার থেকে পণ্যসামগ্রী (বিশেষত বস্ত্রসামগ্রী ও রেশম) কিনে ইউরোপের বাজারে বিক্রি করত। ভারতের বাজারে ইংরেজ বণিকদের এই কেনাকাটাকে 'ইনভেস্টমেন্ট' বলা হত। এই ইনভেস্টমেন্টের খাতে কোম্পানি ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্বের ৫০ বছরে প্রায় ৬৮ লক্ষ পাউন্ড মূল্যের দ্রব্য ও প্রায় ২ কোটি পাউন্ড মূল্যের ব্রিটিশ মুদ্রা আমদানি করেছিল। কোম্পানি ভারত থেকে বিভিন্ন রকম পণ্যসামগ্রী কিনলেও তাদের বিক্রি করার মতো কোনো দ্রব্য না থাকায় তাকে ইংল্যান্ড থেকে বুলিয়ন বা সোনা-রূপা দিয়ে এইসব জিনিস কিনতে হত। এরফলে বাংলায় প্রচুর পরিমাণে সোনা-রূপা আমদানি হত। কিন্তু পলাশির যুদ্ধের পর এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এসময় রাজনৈতিক শক্তিরূপে কোম্পানির আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং সেই সঙ্গে নৃপতিস্রষ্টার ভূমিকা পালনের ফলে প্রচুর অর্থ, উপঢৌকন লাভ ও সবশেষে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি লাভের মাধ্যমে বাংলার রাজস্বের ওপর অধিকার অর্জন কোম্পানিকে বাংলার ধনসম্পদ 'লুটেপুটে খাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। এরফলে কোম্পানিকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিনিয়োগের জন্য আর ইংল্যান্ড থেকে সোনা-রূপা আমদানি করতে হত না। বাংলার রাজস্ব থেকেই এই ইনভেস্টমেন্টের খরচ বহন করা হত। জেমস গ্রান্টের হিসেব অনুযায়ী এই ইনভেস্টমেন্টের পরিমাণ ছিল বছরে ১,৮০,০০,০০০ টাকা। তাই ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পরে বাংলায় সোনার আমদানি কমে গিয়েছিল। বরং ১৭৭৭ থেকে ১৭৮৭ সালের মধ্যে বিপুল পরিমাণ সোনা কোম্পানির চীন বাণিজ্যে বিনিয়োগের জন্য ভারত থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ নিষ্ক্রমণ ছিল

বাংলাদেশের ভূমি-রাজস্বের উদ্বৃত্ত থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করা। কোম্পানি তার চীনা বাণিজ্যেও ইংল্যান্ড থেকে মূলধন না এনে বাংলার উদ্বৃত্ত রাজস্ব দিয়ে চীনের সবুজ চা ও সাদা রেশম ক্রয় করত। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের পর কোম্পানি চীনা বাণিজ্যে বছরে ২৪ লক্ষ টাকা বাংলা থেকে পাঠাত। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই বিনিয়োগের পরিমাণ কমে দাঁড়ায় বছরে ২০ লক্ষ টাকা। এরপর বাংলা থেকে নগদ অর্থের পরিবর্তে আফিম কিনে পাঠানো হত। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি লাভের পর থেকে কলকাতা কাউন্সিল মনে করেছিল তারা এক সমৃদ্ধশালী উর্বরা ভূমি-রাজস্বের চরম শাসক হয়ে বসেছে। বিলেতে পরিচালক সভা এই সময় বেশি অর্থের জন্য চাপ দেয় এবং বেশি বিনিয়োগের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। কোম্পানিও এই সময় থেকে ভারতবর্ষের ব্যবসা-বাণিজ্যকে ইংল্যান্ডে রাজস্ব পাঠাবার এক পথ হিসেবে দেখতে শুরু করে। ১৭৬৫ থেকে ১৭৭০-৭১ সাল পর্যন্ত কোম্পানি বাংলা থেকে ১৩,০৬৬,৭৬১ পাউন্ড রাজস্ব আদায় করে যার প্রায় ৩১ শতাংশ কোম্পানি ভারতে ইনভেস্টমেন্ট খাতে ব্যয় করেছিল। ভেরেলেস্টও স্বীকার করেন যে প্রত্যেক ইউরোপীয় কোম্পানি ভারতের টাকা নিয়ে ভারতেই বিনিয়োগের পরিমাণ অনেকাংশে বৃদ্ধি করেছে। বাংলার উদ্বৃত্ত রাজস্ব নিয়ে কোম্পানির এই যে বর্ধিত বাণিজ্য এতে দেশীয় শিল্পী, কারিগর ও নির্মাতারা কোনোভাবে লাভবান তো হননি, বরঞ্চ কোম্পানির কর্মচারীদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছেন। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতে এবং ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে চীনে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য লোপ পেলে এবং ইংরেজদের ভারতে বসবাসের ও বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হলে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের চাপ ভারতে অনুভূত হয়। ইংল্যান্ডের মিলে উৎপন্ন পণ্য ভারতের বাজার ছেয়ে ফেলে। এইভাবে কোম্পানির এই একপেশে বাণিজ্যে ভারতের সম্পদই শুধু নিষ্কাশিত হয়নি, ভারতের শিল্পী-কারিগর শ্রেণীও ধ্বংস হয়েছিল। এছাড়া বোম্বাই ও মাদ্রাজে বারবার সামরিক ও অসামরিক সাহায্য পাঠানো হলে এবং চীন বাণিজ্যে বিনিয়োগ যুক্ত হলে বাংলায় সম্পদ নিষ্ক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।

বোম্বাই, মাদ্রাজে যে ব্রিটিশ সাহায্য পাঠানো হত তার অন্যতম কারণ ছিল কোম্পানির সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। হায়দার আলি, নিজাম ও মারাঠাদের সঙ্গে কোম্পানি-বাহিনীর যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তা কোনোভাবেই ভারতীয়দের স্বার্থের অনুকূল ছিল না। এই যুদ্ধের ব্যয় কোম্পানি ভারতীয় রাজস্ব থেকেই নির্বাহ করেছিল। সুতরাং, এক অর্থে এটাও ছিল সম্পদ নিষ্কাশন। অন্যদিকে চীনা বাণিজ্যের পরিবর্তে বাংলাদেশ কিছুই পায়নি। এই বাণিজ্য ছিল চীন হয়ে ইংল্যান্ডে সম্পদ নিষ্ক্রমণ। কোম্পানি চীন থেকে চা ও সিল্ক কেনার জন্য বাংলা থেকে প্রচুর পরিমাণে সোনা ও রূপা চীনে পাঠায়। ফলে বাংলায় সোনা-রূপার ঘাটতি দেখা দেয়। ভারতে ব্রিটিশ সরকারের অর্জিত রাজস্বের $\frac{১}{৭}$ অংশ আসত চীনাদের কাছে আফিম বিক্রির অর্থ থেকে। এছাড়া ইংরেজ কর্মকর্তারা

সরাসরি করারোপ ও ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে ভারতের সম্পদ শুষে নেয়। সর্বোচ্চ রাজস্ব আদায়ের জন্য কোম্পানির প্রশাসকবর্গ ভূমি-রাজস্ব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং প্রচলিত ব্যবস্থাকে ওলটপালট করে তারা জমিতে বিভিন্ন রকম মালিকানা স্বত্ব সৃষ্টি করে যাতে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পায়। দেওয়ানি লাভের আগে বাংলায় ভূমি-রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ৮১৭,০০০ পাউন্ড। ১৭৬৫-৬৬ সালে কোম্পানির নেতৃত্বে সেই রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ১,৪৭০,০০০ পাউন্ড। বাংলা থেকে ক্রমাগত এই রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে এই ভূমি-রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ৩,৪০০,০০০ পাউন্ড করেন। এই বিপুল পরিমাণ করের বোঝা প্রজাবর্গের পক্ষে বহন করা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে হোমচার্জ বাবদ প্রচুর টাকা ভারত থেকে বিলেতে পাঠাতে হত। এছাড়া প্রশাসন, বিচার ও সামরিক বাহিনীতে উচ্চ বেতনে ইউরোপীয় কর্মচারীদের নিয়োগের ফলে ভারতের রাজকোষে চাপ পড়ে। এইসব উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মীরা তাঁদের বিপুল সরকারি আয়ের বেশিরভাগটাই বিলেতে পাঠিয়ে দিত। ফলে বাংলার রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে।

পলাশির যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ থেকে কী পরিমাণ সম্পদ নিষ্কাশিত হয়েছিল তার সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা মুশকিল, কারণ প্রতি বছরের জন্য নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান মেলেনি। ভেরেলেস্টের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী দেওয়ানি লাভের পরবর্তী পাঁচ বছরে ৪৯,৪১,৬১১ মিলিয়ন স্টার্লিং পরিমাণ সম্পদ দেশের বাইরে চলে যায়। উইলিয়াম ডিগবি-র হিসেব অনুযায়ী ১৭৫৭ সাল থেকে ওয়াটারলু যুদ্ধের (১৮১৫) সময় পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারত থেকে নিষ্কাশিত সম্পদের পরিমাণ ৫০ কোটি পাউন্ড থেকে ১০০ কোটি পাউন্ডের মাঝামাঝি কোনো অঙ্কের সমান ছিল। দাদাভাই নৌরজীর মতে, ১৭৮৮-৮৯ সাল থেকে ১৮২৮-২৯-এর মধ্যে ভারত থেকে নিঃসারিত সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৫০ কোটি পাউন্ড। জে.সি. সিংহের মতে, ১৭৫৭ থেকে ১৭৮০-র মধ্যে ভারত থেকে ইংল্যান্ডে মোট ৩৮,৪০০,০০০ পাউন্ড সম্পদ নিষ্কাশিত হয়েছিল। সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের আমদানি-রপ্তানির পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে হোল্ডেন ফারবার সম্পদ নিষ্কাশনের পরিমাণ নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। তিনি সম্পদ নিষ্কাশনের সঠিক হিসেব নির্ধারণের জন্য ওলন্দাজ ও দিনেমারদের হুন্ডি বিশ্লেষণ করেছেন। ফারবারের মতে, ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় ১৮ লক্ষ পাউন্ড সম্পদ নিষ্কাশিত হয়। এই সম্পদ নির্গমনের প্রধান ধাক্কা বাংলার উপরেই এসেছিল। কারণ মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ প্রশাসন পরিচালনার যে ব্যয় ছিল সে তুলনায় আয় ছিল কম। সুতরাং, সম্পদ নিষ্ক্রমণের চাপ সেখানে বিশেষ অনুভূত হয়নি। অবশ্য বুলিয়নের প্রত্যক্ষ রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে ইংল্যান্ডে সম্পদ নিষ্ক্রমণ হয়েছিল কি না তা নিয়ে মতানৈক্য আছে। গুলাম হোসেন ও মন্টগোমারী মার্টিনের মতো লেখকেরা দেখাতে চেয়েছেন

যে বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে বুলিয়ন অথবা মুদ্রা রপ্তানি হত। মন্টগোমারী মার্টিন (Montgomery Martin)-এর মতে, ভারত থেকে ইংল্যান্ডে বছরে ৪ মিলিয়ন পাউন্ড সম্পদ নিষ্কাশিত হত। ওয়ারেন হেস্টিংস এবং জন শোরের মতো ব্রিটিশ প্রশাসকরা এ কথা স্বীকার করেছেন। তবে জে.সি. সিংহ ও হ্যামিলটনের মতে, বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ বুলিয়ন ইংল্যান্ডে রপ্তানি হত, একথা ঠিক নয়। অন্যদিকে হোল্ডেন ফারবার মনে করেন, ইউরোপে প্রত্যক্ষ বুলিয়ন রপ্তানি এত কম ছিল না যে তাকে উপেক্ষা করা যায়। ১৭৮৩-৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৯২-৯৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ১.৭৮ মিলিয়ন পাউন্ড সম্পদ নিঃসারিত হয়েছিল।

একতরফা ভারতীয় সম্পদ নিষ্ক্রমণ সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী নেতাদের উদ্বেগ ধরা পড়ে তাঁদের রচনায়। নরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতাদের এই উদ্বেগই ভারতে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছিল। দাদাভাই নৌরজী ও রমেশচন্দ্র দত্ত যথাক্রমে তাদের 'Poverty and Un-British Rule in India' এবং 'Economic History of India' Vol I & II গ্রন্থে সম্পদ নিষ্ক্রমণ তত্ত্বটিকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী সমালোচনার প্রধান স্তম্ভ হিসেবে দাঁড় করান। তাঁদের বিশ্লেষণে ১৮৫৮-এর পরবর্তী যুগের সম্পদ নিষ্ক্রমণই প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁরা মূলত ভারতবর্ষে কোম্পানির বিনিয়োগ, কোম্পানির অংশীদারদের লভ্যাংশে দেওয়া জাতীয় ঋণ ও কর্মচারীদের অর্থনৈতিক সম্পদ আহরণকে সম্পদ নির্গমনের মধ্যে ধরেছেন। এই জাতীয়তাবাদী লেখকেরা সম্পদ নির্গমনকে ভারতবর্ষের দরিদ্রতার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের প্রচেষ্টাতেই ঊনবিংশ শতকের শেষপর্বে সম্পদ নির্গমন তত্ত্বটি রাজনৈতিক মাত্রা লাভ করে। ব্রিটিশ সরকারের শোষক রূপটি তারা জনসমক্ষে তুলে ধরেন। প্রখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক থিওডর মরিসন তাঁর 'The Economic Transition in India' গ্রন্থে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাদের দেওয়া সম্পদ নির্গমন তত্ত্বটিতে অতিরঞ্জন রয়েছে। পি.জে. মার্শালও প্রায় একই সুরে বলেন যে বাংলা থেকে অপহার বা সম্পদ নির্গমনের প্রক্রিয়া একতরফা হয়নি। মরিসনের পক্ষ নিয়ে এল.সি.এ. নল্‌স (L.C.A. Knowles) ও ভেরা অ্যানস্টি (Vera Ansty) সম্পদ নিষ্ক্রমণ তত্ত্বকে সমালোচনা করেছেন। তাঁরা একে একতরফা সম্পদ নিঃসারণ বলে মেনে নিতে নারাজ। তাঁদের মতে, জাতীয়তাবাদী নেতাদের দেওয়া আমদানি-রপ্তানির তালিকায় 'শিপিং সার্ভিস', 'ইনসিওরেন্স চার্য'-এর মতো অদৃশ্য আমদানিকে হিসেবের তালিকায় ধরা হয়নি। মরিসনের মতে, বাৎসরিক সম্পদ নিঃসারণ ২১ মিলিয়ন স্টার্লিং-এর বেশি হয়নি। তিনি যুক্তি দেখান যে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য থেকে ইংরেজদের যে লাভ হয়েছিল তার বিনিময়ে ভারতীয়রাও তাদের দেশের আর্থিক বিকাশের জন্য বিদেশি মুদ্রার সাহায্য পেয়েছিল। রেলওয়ে শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে, কারিগরি কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং সাধারণ ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ব্রিটিশ

অর্থাপহরণের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। একথা ঠিক যে এই সময়ের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া জটিল, কিন্তু যে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে বলা যায় যে ভারত থেকে ইংল্যান্ডে সম্পদ নিষ্ক্রমণ হয়েছিল এবং তার ফলে তার চাপ ভারতীয় অর্থনীতিতে গভীরভাবে অনুভূত হয়েছিল।